Downloaded from: justpaste.it/5aai1

মিথ্যে গণতন্ত্র

যদিও ইরাক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আমেরিকা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাথে আলোচনা করেনি, এবং সাধারন পরিষদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি, তবুও বাস্তবতা হল জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ দুটোই আমেরিকার পরিকল্পন অনুযায়ীই ১৯৪৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এ গণতন্ত্রকে ঘিরে একটি মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করা হয় আর তা হল, মুসলিম উম্মাহ ও দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিই হল মুসলিম উম্মাহর তীব্র সমস্যার কারণ।

তাই বুশ মুসলমানদেরকে গণতন্ত্রের ছায়ায় বসবাস করানোর জন্য উৎসাহী হয়। অতঃপর সে নিজেকে আরব রাজ্যগুলোতে ত্রানকর্তারূপে চিত্রিত করলো। বুশ নিজেকে মানুষের জন্য ঐশ্বরিক সহায়তার দূত তথা খোদা প্রদত্ত সাহায্যকারী হিসেবে পেশ করলো, যে তাদেরকে অন্ধকার থেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আলোর দিকে নিয়ে আসবে।

আর এভাবে সে বিশ্ব মানবতাকে “গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার” আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী বুশ মুসলমানদেরকে এই ফতোয়া প্রদান করে যে, গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বা বিরোধী না। অবাক ব্যাপার হল, কিছু নামধারী মুসলিমরাও আমাদের জন্য এই গণতন্ত্রকে টেনে আনতে চায়। তারা গণতন্ত্রকে এতই সীমাবদ্ধ ভাবে সজ্ঞায়িত করে যে, এটি যেন শুধু ব্যালট বক্সের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শাসক নির্বাচন করার অধিকার।

কিন্তু বাস্তবতা হল, মানুষ, গণতন্ত্র জীবন ও বিশ্বকে নিয়ে এক সামগ্রিক জীবন দর্শন ও চিন্তা থেকে উদ্ভূত একটি ধারণা। যা হল এমন এক সভ্যতার ফসল যা ব্যাপকভাবে ইসলামি সভ্যতা থেকে আলাদা এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক।

*পশ্চিমা সভ্যতা গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার নীতির উপর ভিত্তি করে। যখন রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে দেওয়া হলো তখন কোন আইন-কানুন ও হুকুম-আহকাম দ্বারা সমাজ এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হবে? কে করবে? গণতন্ত্রের আদর্শের মূলনীতি অনুযায়ী, এ প্রশ্নের উত্তর হল – জনগণ।
*ইসলামে বিধানদাতা ও আইনপ্রণেতা হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা; জনগণ শুধু সুলতান বা শাসকের সহযোগী। আর শরিয়ত শাসক নির্বাচনের সঠিক প্রদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছে। এজন্যই খেলাফতের সময়টা ছিল সোনালী যুগ, যা সকলেরই সন্তুষ্টি এবং পছন্দের ছিল। আর খলিফা জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ইসলাম পালনে সহায়তা করতেন। কোনো জাতির বা শাসকের কিংবা সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না।

এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে কয়েকটি পয়েন্ট বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত-

১. শরিয়তের আগে কোনো শাসন নেই :

শরিয়ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, হাকিম হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। আর তিনিই আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহির মাধ্যমে বিধিবিধান নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ

“বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই।” (সুরা ইউসুফ-৪০)

তিনি আরও বলেন-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ

“যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে ফায়সালা করে না তারাই অবিশ্বাসী কাফের।” (সুরা মায়েদা-৪৪)

তিনি আরও বলেছেন-

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

“আর আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে ফায়সালা করুন।” (সুরা মায়েদা-৪৯)

সুতরাং যারাই আল্লাহর বিধান দিয়ে ফায়সালা করবে না তারাই তাগুত। যেমন- আল্লাহ বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

“আপনি কি ঐ সমস্ত লোকদের দেখেননি যারা ধারণা করে, আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তারা তার উপর ঈমান আনয়ন করেছে। অথচ তারা বিবাদমান বিষয়কে তাগুতের কাছে ফায়সালা চায়। আর তাদের আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অস্বীকার করে। আর শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে গোমরাহ করতে চায়।” (সুরা নিসা-৬০)

আর আল্লাহর হুকুম জানার মাধ্যম হলো তাঁর রাসূলের উপর নাযিলকৃত ওহি। এজন্যই ফাতরতের তথা শরিয়ত নাযিলের বিরতি কালের মানুষেরা মুক্তি প্রাপ্ত হবে।[1] আর ফাতরাহ বলা হয় ওই সময়কে, যারা বাতিল কিংবা বিকৃত শরিয়তের কারণে একটি নতুন শরিয়ত আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে বসবাস করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

“আমি রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে শাস্তি প্রদান করি না।” (সুরা বনী ইসরাইল-১৫)

সুতরাং যারা আজ আমাদের জন্য গণতন্ত্রকে টেনে আনতে চায়, যেমন যেসব দাবি করে শাসন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না, তারা হয় আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দাবি করছে যে, আমাদের জ্ঞান আল্লাহর হুকুম থেকে অধিক উপযুক্ত -নাউযুবিল্লাহ! অথবা তারা দাবি করছে আমরা ফাতরাতের সময়ের অধিবাসী। আর আসল ব্যাপার হলো, উভয় দাবিই ভ্রান্ত।

মূলত আকল তথা জ্ঞানের কোনো শাসন ক্ষমতা নেই, কারণ এটি শাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং আকল হুকুম পরিচালনা করার দাবিটি ভ্রান্ত। কেননা আক্বলের নামে শাসন করবে স্বার্থরক্ষা, প্রবৃত্তি ও প্রবণতা।

আর দ্বিতীয় দাবিটি অবৈধ। কারণ, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং তাঁর রিসালাতই সর্বশেষ আসমানী রিসালাত। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার বিকৃতি সাধন থেকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

যখন গণতন্ত্র জনগণকে বিধান বানানোর অধিকার দেয় আর ইসলাম এই অধিকার সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার জন্য সাব্যস্ত করে, ফলে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। সুতরাং প্রথমটি হবে কুফর আর দ্বিতীয়টি ঈমান।

২. ইসলামে শাসক নির্বাচন করার প্রক্রিয়া :

যারা শুধু গণতন্ত্রকে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে শাসক নির্বাচিত করার মাঝেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেন তারা ভ্রান্ত ধারণায় আছেন।

যেমনটা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, গণতন্ত্র জনগণকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়, ধর্মে মসজিদের কোণায় আবদ্ধ করে, আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের সুফলের কথা বলে। কিন্তু যারা এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত তারা এতে বিভ্রান্ত হন না।
আর ইসলামে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিগুলো হল-

*আবু বকর সিদ্দিক রা. মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন বনি সা’দ গোত্র থেকে আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’র ভিত্তিতে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তে সঠিক পরামর্শদানে সক্ষম, কুরআন সুন্নাহের জ্ঞানে পারদর্শী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে। অতঃপর মুসলিম উম্মাহ হযরত আবু বকর রা.-কে সন্তুষ্টচিত্তে রবিবার দিন মসজিদের মাঝে পূর্ণ আনুগত্যের বাইয়াহ প্রদান করে।
*অতঃপর খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে সাইয়্যেদুনা আবু বকর রাযি. মনোনীত করে গেছেন। মুসলিম উম্মাহও তাকে সন্তুষ্টচিত্তে বাইআহ প্রদান করেছেন।
*অতঃপর উসমান রা.কে বাইআহ প্রদান করেন। বর্ণিত আছে, আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রা. মদীনার লোকদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’র সাথে শূরার বিষয়টি শুধু জিজ্ঞাসার

মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
*আলী ইবনে আবি তালিব রা. এর শাসনের সময় মদিনার অধিকাংশ অধিবাসী এবং কুফার অধিবাসীগণ তাকে এককভাবে সন্তুষ্টচিত্তে বাইআহ দিয়েছিল।

তাই আমরা যেগুলোকে 'প্রক্রিয়া' বলছি সেগুলো হল বাইআহ দেয়ার আগে খলিফা নির্বাচনের কিছু প্রায়োগিক, ব্যবহারিক পন্থা, আর এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, আর সে উদাহরণও আছে। যেমনটা হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের সাথে যে, আর খোলাফায়ে রাশেদীন এসব প্রায়োগিক পন্থার নির্দিষ্ট কোনো পন্থাকে নিজেদের বা পরবর্তীদের জন্য আবশ্যক করেননি। ব্যালট বাক্স একাধিক প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করার এরকম একটি প্রায়োগিক পন্থা, কিন্তু তাই বলে এর জন্য গণতন্ত্রকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে, এটা কোন যৌক্তিক কথা না। একাজটিই (ব্যালট বাক্স) গণতন্ত্রের মৌলিক দাবি নয়। অথচ উম্মত বোঝানো হচ্ছে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আমাদের পণ্য আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. সভ্যতা ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য :

যারা আমাদের কাছে গণতন্ত্র গ্রহণের দাবি করে তাদের অনেকেই সভ্যতা ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য করে না; অন্য ভাবে বলা যায়, যা কাফিরের কাছ থেকে কী গ্রহণ করা যাবে আর কী গ্রহণ করা যাবে না – এ দুয়ের মধ্যে তারা পার্থক্য করে না। সুতরাং তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, আপনি টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, অস্ত্র এবং এমনকি পোশাক থেকে শুরু করে সমস্ত সরঞ্জাম পশ্চিমাদের ব্যবহার করেন, তাহলে কেন আপনি গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেন?

তাদের উপরই আল্লাহর রসূলের কথা সত্যায়িত হয়।

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم)، قيل: من يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟!

"পূর্ববর্তীদের রীতিনীতিকে তোমরা ইঞ্চি ইঞ্চি এবং বিগত বিগতভাবে অনুসরণ করবে, এমনকি যদি সেগুলো পাথরের গুহায়ও প্রবেশ করে তোমরা তাদের পিছু পিছু সেখানেই প্রবেশ করবে। তাঁকে বলা হলো, কাদের ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহুদি এবং নাসারাদের? তিনি বললেন, তাহলে তারা ছাড়া আর কারা?।" (বুখারি শরীফ- ৬৮৮৯)

আরেকটি বিষয় হলো, গণতন্ত্র কোন প্রযুক্তি না। যেমনটা বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা ইন্টারনেট। বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, ইন্টারনেট এগুলো প্রযুক্তি। এগুলোর সাথে কোন আক্বিদা জড়িত না, জীবন দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত না। তাই মুসলিমরা এগুলো যে কারো কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে, তার ধর্ম যাই হোক না কেন। অন্যদিকে গণতন্ত্র হল এমন এক সভ্যতার ফসল যা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথককরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৪. সংজ্ঞা এবং পরিভাষাগত সমস্যা :

'গণতন্ত্র' শব্দটি একটি পশ্চিমা শব্দ, যার অর্থ হলো জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার প্রদান করা, আর তার মৌলিক বিষয় এটির মাঝেই সীমাবদ্ধ। গণতন্ত্রের অনুসারীরা এই অর্থেই গ্রহণ করে।

অতএব এ অর্থের প্রেক্ষিতে (মুসলিম বিশ্বে) গণতন্ত্রের অনুসারীদের প্রতি আমরা বলি –

*গণতন্ত্রে মানুষকে একজন শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করে।
*গণতন্ত্রে একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে একজন শাসক হিসাবে বাছাই করার জন্য সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচনের আয়োজন করা হয়ে থাকে
*গণতন্ত্রে মজলিসে শাসককে নির্বাচিত পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

এ কথাগুলো হল গণতন্ত্রের আংশিক বর্ণনা। যেমনটা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, এভাবে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করলে বিস্তৃত একটি ধারণাকে সংকোচিত করে প্রকাশ করা হয়। আর এভাবে সংজ্ঞায়িত করা ও শব্দের ব্যবহার ইসলামের 'ইলমি পদ্ধতি না। কারণ সঠিক ধারণার জন্য সঠিক শব্দ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, যা গ্রহণ করা জায়েজ না তা গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। কারণ এরকম করা হলে, যে ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার অর্থের বিচ্যুতি ঘটে, এবং সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। সুতরাং এভাবে (অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত তিনটি পয়েন্টের মধ্যে) গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হলে তা সঠিক ও সর্বজনীন সংজ্ঞা হয় না। বরং তা এমন একটি সংজ্ঞা হয় যা সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বিষয়কে একীভূত করে নি, এবং সংজ্ঞা বহির্ভূত বিষয়গুলোকে সংজ্ঞাতে ঢুকে যেতে বাঁধা প্রদান করেনি।

অতএব, আমরা আইনশাস্ত্রের ভাষায় যাকে শূরা এবং ইসলামি সংস্কৃতি বলি গণতন্ত্রটা তার আধুনিক রূপায়ন নয়। শুধু সঠিক পরিভাষা বা শব্দ ব্যবহার করার মধ্যেই ইসলামি মূলনীতি সীমাবদ্ধ না। শূরার অর্থে সাথে সাংঘর্ষিক একটি বিষয়ের (অর্থাৎ গণতন্ত্র) উপর শূরা শব্দটি প্রয়োগ করলেই সেটা ইসলামি হয়ে যাচ্ছে না।

আর শূরা বলা হয়, ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে। আর এটি ইসলামি শরিয়াতের একটি হুকুম, যার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আর গণতন্ত্র হলো, মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে মানুষের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, যার অধীনে নাস্তিক তার নাস্তিকতার জন্য মানুষকে আহ্বান করার অনুমতি পায় এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদী এই ঘোষণা করতে পারে যে, ইসলাম বর্তমান জামানার জন্য অনুপযোগী আর কোরআন হলো মানুষের রচিত বইয়ের মতোই, যার সমালোচনা করা যেতে পারে। এছাড়াও গণতন্ত্র কুফরি এবং নাস্তিকতার দিকে ডাকার সুযোগ করে দেয়।

৫. গণতন্ত্রের নামে মিথ্যা এবং প্রতারণার একটি বর্ণনা :

বলা হয় যে, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। এ কথাটি বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারণাপূর্ণ। এমনকি বিশ্বের গণতন্ত্রের অন্যতম দাবিদাররাও সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। আর রাজ্যগুলোর শাসক, সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং সরকার প্রধানরা রাজ্যের ওইসকল ক্ষমতাশীলদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা মোটা অংকের টাকা দিয়ে তাদের স্বার্থ সুরক্ষা করতে পারে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ক্ষমতার শক্তির প্রচলন কেবলমাত্র দুই পক্ষের জন্যই সীমাবদ্ধ হয়। এক দল হলো রিপাবলিকান এবং আরেক দল হলো ডেমোক্রেটিক পার্টি, অথবাকিংবা কনজারভেটিভ পার্টি এবং লেবার পার্টি। সুতরাং এটি গোত্র, বংশ এবং রাজকীয় পরিবারের শাসনের একটি পরিবর্তিত চিত্র নয় কি?

৬. ইসলাম বাস্তবায়নের পূর্বে স্বাধীনতা কামনার ভ্রান্ত ধারণার বর্ণনা:

মুসলিম বিশ্বের কাফির-মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী এবং দালালরা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে এবং পশ্চিমা কুফফারের সহায়তা অথবা আনুগত্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

আর যারা কাফিরদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন –

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"তুমি কখনোই ইহুদি এবং নাসারাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের ধর্ম গ্রহণ করবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ১২০)

উদাহরণস্বরূপ, আলজেরিয়ায় 'স্যালভেশন ফ্রন্ট' গণতান্ত্রিকভাবে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সরকার গঠন করার কথা ছিল, কিন্তু সেনাবাহিনী'র হস্তক্ষেপে নির্বাচন বাতিল করা হয় এবং স্যালভেশন ফ্রন্ট'কে নিষিদ্ধ করে তাদের নেতাদেরজেলখানায় বন্দি করা হয়।

একইভাবে মিশরের ইখওয়ানকে সরকার একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে লাইসেন্স তথা স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছে, যদিও ইখওয়ান তাদের নিজেদের আদর্শে এবং এ শাসকগোষ্ঠীকে অনেক ছাড়া দিয়েছে।

তারপরও যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে স্বাধীনতা – এঈ স্লোগান তোলে তাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন, আমাদের কাছে স্পষ্ট করা হোক, যখন এ ধরণের স্বাধীনতা থেকে বাধা দেওয়া হবে, তখন কর্মপন্থা কী হবে?

৭. গণতন্ত্রের প্রত্যাখ্যান মানেই একনায়কত্বের দাবি নয় :

আপনি যদি ডেমোক্র্যাটিক তথা গণতান্ত্রিক না হন, তবে আপনি একজন স্বৈরশাসক!

আপনি যদি পুঁজিবাদী না হন, তবে আপনি সমাজতান্ত্রিক!

যদি আপনি স্বাধীনতার দাবি না করেন, তাহলে আপনি অত্যাচারী!

সুতরাং এভাবে আপনি সবসময় দুটি বিকল্পের মধ্যে আটকা পড়ে আছেন, তাই আপনাকে তৃতীয়টি পছন্দ করতে হবে যে, আমি একজন গণতান্ত্রিক নই, আমি একজন স্বৈরশাসক নই, আমার পক্ষে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক হওয়াও সম্ভব নয় এবং আমি পশ্চিমাদের মনগড়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আছি।

আমি একজন মুসলিম আর ইসলামই মূল। এর কোনো বিকল্প নেই। আর ইসলামের শাসক স্বৈরশাসক নয়, তবে সে শরিয়তের বিধিবিধান দ্বারা আবদ্ধ। আর তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে শরিয়তের আইন কানুন বাস্তবায়ন করার জন্য। শরিয়তের আহকাম পরিচালনা ব্যতীত তার কোনো ক্ষমতা নেই। এজন্য সে যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়ত মোতাবেক আদেশ করবে, ততক্ষণ তা মান্য করা ওয়াজিব। আর নাফরমানীর আদেশের ক্ষেত্রে কোনো

আনুগত্য নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

“মুসলমান ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা। চাই তার পছন্দ হোক কিংবা না হোক, যতক্ষণ না নাফরমানীর আদেশ করে। আর যদি নাফরমানীর আদেশ করে তাহলে এক্ষেত্রে কোনো শ্রবণ বা আনুগত্য নেই।”(সহিহ বুখারি-৬৭২৫)

এমনিভাবে যদি তার থেকে কুফরে বাওয়াহ তথা সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যায় তাহলে সে ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন –

“বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে উত্তম ফায়সালাকারী আছে?” (সুরা মায়েদা-৫০)[2]

মূল – শরীফ আব্দুল্লাহ

অনুবাদ – উস্তাদ আহমাদুল্লাহ মুসা

—

[1] وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا “আমি রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে শাস্তি প্রদান করি না”- ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “এই আয়াতে আহলে ফাতরাহ’দের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এই মাসআলায় আইম্মায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন হাদিস এবং কদীম তথা নতুন ও পুরাতন নিয়ে। আর তা হলো, ঐ সমস্ত শিশু যারা ছোট অবস্থায় মারা যায় আর তাদের পিতামাতা কাফের থাকে, তাহলে কি হুকুম হবে? এমনিভাবে পাগল, বধির, অতিবৃদ্ধ এবং যারা ফাতরতের সময় মারা গেছে তাদের নিকট দাওয়াতও পৌঁছেনি, তাদের কি হবে? এ বিষয়ে কিছু উলামায়ে কেরাম নিরবতা অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের থেকে কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বস্তুর পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর সকল মতামতগুলোই বিভিন্ন দলীলের কারণে হয়েছে। আর এ বিষয়ের সাথে অনেক বৈপরীত্যশীল সহিহ হাদিসও পাওয়া যায়। শাইখ আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশআরী রহ. এ মতটিকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আবু বকর আল বাইহাকীও তার রচিত ‘কিতাবুল ই’তিকাদ’ এ বিষয়টিকে মজবুতভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে অন্যান্য জ্ঞানী আলেমরা এবং বর্ণনাকারীদের মান যাচাইকারীরাও এ মত ব্যক্ত করেছেন”। – ‘মিম্বার আত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ’ কর্তৃপক্ষের টিকা।

[2] মূল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল লেবাননের ম্যাগাজিন ‘মাজাল্লাহ আল-ওআয়ি এর মুহররম, ১৪২৬ হি. সংখ্যায়। মাজাল্লাহ আল-ওআয়ি’